রবীন্দ্রনাথের চোখে ‘নারী’

ডঃ হুমায়ুন আজাদ

পর্ব-৩

তিনি রুশো-রাস্কিন, ভিক্টোরীয় ও সমগ্র পুরুষতন্ত্রের মতো বিশ্বাস করেন যে নারীপুরুষ সমকক্ষ নয়, নারী প্রাকৃতিকভাবেই পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট। … প্রকৃতির স্বর শোনা প্রথাবাদীদের স্বভাব, কেননা তাতে যুক্তি ও সত্যের বদলে উপস্থিত করা যায় অলৌকিক শক্তিকে, এবং সবকিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় শোষিতদের উপরে। … রবীন্দ্রনাথ, যাকে মনে করা হয় নিজের সময়ের থেকে অনেক অগ্রসর, আসলে পিছিয়ে ছিলেন নিজের সময়ের চেয়ে হাজার বছর।

পূর্ববর্তী পর্বের পর …

ভিক্টোরীয় সমাজে মেয়েদের জীবনের লক্ষ্য যে বিয়ে, সেখানে পুরুষই যে সর্বময়, ওই সমাজের সাথে বাঙালি সমাজের পার্থক্য যে গুণের নয় বরং মাত্রার তা চোখে পড়েছে তাঁর (*রর*, ১, ৫৭০):

> আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্য প্রস্তুত করে, যথেষ্ট লেখা পড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আপিসে যেতে হবে না; এখানেও তেমনি মাগগি দরে বিকোবার জন্য মেয়েদের পালিশ করতে থাকে, বিয়ের জন্য যতটুকু লেখাপড়া দরকার ততটুকু যথেষ্ট। একটু গান গাওয়া, একটু পিয়ানো বাজানো, ভালো করে নাচা, খানিকটা ফরাসী ভাষা বিকৃত করে উচ্চারণ, একটু বোনা ও সেলাই করা জানলে একটি মেয়েকে বিয়ের দোকানে জানালায় সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত রঙচঙে পুতুল গড়ে তোলা যায়। এ-বিষয়ে একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যতটুকু তফাত, আমাদেরও এ দেশের মেয়েদের মধ্যে ততটুকু তফাত মাত্র। আমাদের দিশি মেয়েদের পিয়ানো ও অন্যান্য টুকিটাকি শেখবার দরকার পরে না, বিলিতি মেয়েদেরও অল্প-সল্প লেখাপড়া শিখতে হয়, কিন্তু দুই-ই দোকানে বিক্রি হবার জন্য তৈরী। এখানেও পুরুষেরাই হর্তা কর্তা, স্ত্রীরা তাদের অনুগতা; স্ত্রীকে আদেশ করা, স্ত্রীর মনে লাগাম লাগিয়ে ইচ্ছে মত চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধিকার মনে করেন।

তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য সমাজ ও নারী দু-ই, তবে মেয়েদের ওপরই আক্রমণটা একটু বেশী; তিনি মনে করেছেন যেনো মেয়েরা নিজেরাই পুতুল হবার জন্য পাগল। অন্য ধরনের নারীও তিনি দেখেছেন ওই সমাজে : ‘*ফ্যাশনী মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো অন্যরকম মেয়ে আছে,*

নইলে সংসার চলত না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মেয়েদের অনেকটা মেহনত করতে হয়, বাবুয়ানা করলে চলে না। এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেনীর গিন্নিরা সাদাসিদে। যদিও তারা ভাল করে লেখাপড়া শেখেন নি, তবু তারা অনেক বিষয় জানেন, এবং তাদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিস্কার' (*রর,* ১-৫৭০-৫৭১)। তিনি কিছুটা শ্রদ্ধাশীল সে নারীর প্রতি, 'যারা ফ্যাশনমত্ত নয়, যারা কর্মী, মধ্যবিত্ত, যারা আছে বলে সংসার চলে'। তবে ওই ফ্যাশনমত্তরাই কিছুদিনের জন্য তাঁকে করে তুলেছিলো সীমিত নারীস্বাধীনতাবাদী, কেননা ওই স্বাধীনতাটুকু ছাড়া মেয়েদের নাচের আসরে পাওয়া অসম্ভব। মেয়েরা অবাধে নাচের আসরে আসতে না পারলে মেয়েদের থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাঁর মতো তরুণেরা, যারা গালে গাল ঘষে নাচতে চায়।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে তিনি নারী-স্বাধীনতার অর্থাৎ নারীপুরুষের মেলামেশার পক্ষে কিছু মত প্রকাশ করেছিলেন, বাঙালী নারীকে ঘরে আটকে রাখার অপরাধে অভিযুক্ত করেছিলেন পুরুষদের। বলেছিলেন, *'একজন বুদ্ধি ও হৃদয়বিশিষ্ট মানুষকে জন্তুর মতো সম্পুর্ণরূপে নিজের প্রয়োজনের জিনিস গড়ে তোলা এসকল যদি পাপ না হয়, তবে নরহত্যাও পাপ নয়।'* [য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র থেকে বর্জিত, উদ্ধৃত অনন্যা (১৩৯৪, ২০)]। এমন কয়েকটি স্ত্রী স্বাধীনতাবাদী অংশ বইটি থেকে বর্জনের সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতার ধারণাটিও। রবীন্দ্রনাথের ওই 'স্ত্রীস্বাধীনতা'য় বিশ্বাস ছিলো বিলেতি তরুনীদের সাথে মেশার ফলে তরুণ রক্তমাংসের ভেতর থেকে বেরোনো আস্থায়ী উচ্ছ্বাস, যা মিলিয়ে যেতে বেশি সময় লাগেনি। বাঙালি নারীকে অন্তঃপুর থেকে মুক্তি দেয়া সম্পর্কে যে কয়েক পংক্তি লিখেছিলেন তিনি আঠারো-উনিশ বছর বয়সে, প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় তা বই থেকে মুছে ফেলে তারুন্যের আশিষ্ট উচ্ছ্বাসের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি দ্বিধা করেননি।

এর পর দু-বছরের মধ্যেই নিজে হন স্বামী (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩), এবং এক দশক কাটার আগেই হয়ে ওঠেন নারীমুক্তিবিরোধী, সম্ভবত তখন তাঁর তরুনীদের সাথে মেলামেশার প্রয়োজন ফুরিয়েছে ব'লে। পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে তিনি আয়ত্ব করে ফেলেন নারী সম্পর্কে ভিকটোরীয় ও ভারতীয় দর্শন : প্রবক্তা হয়ে ওঠেন *ঘরেবাইরে তত্ত্বের, প্রকৃতিতত্ত্বের, নারী পুরুষের অসাম্যতত্ত্বের, পরিপূরকতত্ত্বের,* এবং আপন করে নেন পুরুষতন্ত্রের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা। এর পরিচয় প্রথম ধরা পরে 'রমা বাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে' (১২৯৬, *রর:* ১২, ৪৫০-৪৫৫) নামের পত্রপ্রবন্ধে। মহারাষ্ট্রি নারীবাদী রমাবাই নারীমুক্তি সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন পুনায় (জৈষ্ঠ ১২৯৬), তবে শেষ করতে পারেননি বক্তৃতাটি; পুরুষাধিপত্যবাদীদের প্রচন্ড উৎপাতে তিনি স্থগিত করতে বাধ্য হন বক্তৃতা। আটাশ বছর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ নিজে কোন উৎপাত করেননি, তবে বক্তৃতা সম্পর্কে তিনি যে মত দিয়েছেন তাতে তার পুরুষাধিপত্যবাদিতা প্রকাশ পেয়েছে প্রবলভাবে। তিনি রুশো-রাস্কিন, ভিক্টোরীয় ও সমগ্র পুরুষতন্ত্রের মতো বিশ্বাস করেন যে নারীপুরুষ সমকক্ষ নয়, নারী প্রাকৃতিকভাবেই পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট। একজন চমৎকার ভিক্টোরীয় হিশেবে তিনি নারীদের মধ্যে দেখেছেন শুধু রূপ আর আবেগ, দেখেছেন নারীদের শক্তিহীনতা, প্রতিভাহীনতা, আর

এ সবই তাঁর মতে প্রাকৃতিক। তিনি বলেন, 'মেয়েরা সকল বিষয়েই যদি পুরুষের সমকক্ষ, তাহলে পুরুষের প্রতি বিধাতার নিতান্ত অন্যায় আবিচার বলতে হয়।' তাঁর চোখে নারী পুরুষের অসাম্যই ন্যায় সঙ্গত, আর সাম্য অন্যায়; প্রকৃতি বা বিধাতা এমন অন্যায় করতে পারে না। ভিক্টোরীয়দের মতো তিনি নারী পুরুষকে প্রাকৃতিকভাবেই দুটি বিপরীত ও পরিপূরক জাতির সদস্য বলে মনে করেন :

> আমরা যেমন বলে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনি রূপে শ্রেষ্ঠ; অন্তঃকরণের বিষয়ে আমরা যেমন বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনি হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ; তাই স্ত্রীপুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করতে পারছে। স্ত্রী লোকের বুদ্ধি পুরুষদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প ব'লে স্ত্রী শিক্ষা অত্যাবশ্যক এটা প্রমাণ করবার সময় স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের ঠিক সমান একথা গায়ের জোরে তোলবার কোন দরকার নেই।

রুশো-রাসকিন-টেনিসন ও সমগ্র পুরুষতন্ত্র এখানে কথা বলছে রবীন্দ্রনাথের মুখে। তাঁর কিছু বিশ্বাস বেশ ভয়ংকর, যেমন বিশ্বাস করেন তিনি প্রাকৃতিক ও সামাজিক অসাম্যে। তিনি বিশ্বাস করেন পরস্পরকে অবলম্বন করতে হলে সমান হলে চলে না, হ'তে হয় অসম। এটা শুধু পারিবারিক ভাবে ভয়ঙ্কর তত্ত্ব নয়, সামাজিকভাবেও ভয়ঙ্কর। পুরুষদের বুদ্ধিতে শ্রেষ্টত্ব সম্পর্কে তিনি এত নিশ্চিত যে, সে সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুললে তিনি রুষ্ট হন। তিনি বিশ্বাস করেন একটি বানানো উপকথায় যে, *নারী বুদ্ধিতে পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট*; এবং ঘোষনা করেন যে, 'মেয়েরা কখনই পুরুষদের সঙ্গে (কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে) বুদ্ধিতে সমকক্ষ হবে না'। পুরুষতত্ববাদীরা বারবার যুক্তি দেয় যে, নারীর প্রতিভা নেই, পৃথিবীতে কোন বড় নারী প্রতিভা জন্মেনি, মিল যা খন্ডন করেছেন নারী-অধিনতায় (১৮৬৯); কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ তে পেশ করেছেন পুরুষতত্ববাদীদের পুরোন যুক্তি আর উদাহরণ :

> মেয়েরা এতদিন যা শিক্ষা পেয়েছে তাই যথেষ্ট ছিল।...স্ত্রী জাতির মধ্যে প্রথম শ্রেনীর কবির আবির্ভাব এখনো হয়নি। মনে করে দেখো, বহুদিন থেকে যত বেশি মেয়ে সংগীতবিদ্যা শিখেছে এত পুরুষ শেখেনি। ইউরোপে অনেক মেয়েই সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত পিয়ানো ঠং ঠং এবং ডেরেমিফা চেঁচিয়ে মরছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ক'টা Mozart এবং Beethoven জন্মাল?

পুরুষতন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন ব'লেই তিনি বলতে পেরেছেন মেয়েরা যে-শিক্ষা পেয়েছে তাই যথেষ্ট। আসলে মেয়েদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এতোদিন, তা কোন শিক্ষাই নয়, তা পুরোপুরি অশিক্ষা। ওই অশিক্ষার মধ্যে থেকে যে কারো পক্ষে ভিঞ্চি, দান্তে বা বিটোফেন হওয়া সম্ভব নয়, তা রবীন্দ্রনাথ, একজন প্রবল পুরুষাদিপত্যবাদী, মানেননি; এও তার মনে পড়ে নি যে, পৃথিবীতে মোৎজার্ট-বিটোফেন দু'টির বেশী জন্মেনি- পুরুষমাত্রই একেকটি সম্ভাব্য মোৎজার্ট বা নিউটন বা রবীন্দ্রনাথ নয়। পুরুষতন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ বরং রুশোর

মত বলেছেন, *'প্রতিভা একটি শক্তি, তাতে অনেক বল আবশ্যক, তাতে শরীর ক্ষয় করে। তাই মেয়েদের এরকম গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই'*, বা *'মেয়েদের একরকম চটপটে বুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধারণত পুরুষদের মত বলিষ্ট বুদ্ধি নেই।'* উগ্র পুরুষতন্ত্রবাদী রবীন্দ্রনাথ ঘোষনা করেছেন, 'মেয়েরা হাজার বছর পড়াশূনো করুক, এই কার্যক্ষেত্রে কখনোই পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে নাবতে পারবে না।' মেয়েদের পড়াশুনোয় তাঁর বিশেষ আপত্তি নেই, বা তিনি মনে করেন মেয়েদের পড়াশুনো বিশেষ কাজে লাগে না; তবে তাঁর আপত্তি 'কার্যক্ষেত্র' দখলে। পুরুষ যে-সমস্ত পেশা দখল করে রেখেছে, সেগুলোতে নারী ঢুকুক, তা তিনি চান না, নারী যদি নিষেধ না শুনে সেখানে ঢুকে পড়ে, তাহলে তিনি চান তার ব্যর্থতা।

নারীপুরুষদের অসাম্যকে শাশ্বত করার জন্য এরপর তিনি সাহায্য নিয়েছেন রুশো-রাসকিন ও ভিক্টোরীয়দের প্রকৃতি তত্ত্বে। সুবিধাবাদীরা আর আধিপত্যবাদীরা, এবং পুরুষতন্ত্র প্রকৃতিকে চিরকাল ব্যবহার করেছে নিজেদের স্বার্থে। রবীন্দ্রনাথও নারীদের ঘরে আটকে রাখার জন্য দোহাই দিয়েছেন প্রকৃতির, যদিও প্রকৃতি নয়, সমাজের চক্রান্তেই নারীরা বন্দি হয়ে আছে ঘরে। প্রকৃতির 'কন্ঠস্বর' শুনে তিনি তা বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন এভাবে :

> যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হত তা হলে মেয়েরা বলিষ্ট হয়ে জন্মাত। যদি বল পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এমন অবস্থা হয়েছে, সে কোন কাজেরই কথা নয়।

প্রকৃতির স্বর শোনা প্রথাবাদীদের স্বভাব, কেননা তাতে যুক্তি ও সত্যের বদলে উপস্থিত করা যায় অলৌকিক শক্তিকে, এবং সবকিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় শোষিতদের উপরে। প্রকৃতি স্থির করে দিয়েছে যে, মানুষ স্বামীস্ত্রী হবে, সংসার করবে, সমাজ বানাবে, রাষ্ট্র তৈরী করবে, একদল শোষন করবে, আরেকদল শোষিত হবে- এটা খুবই হাস্যকর আর সুবিধাবাদী বিশ্বাস; রবীন্দ্রনাথ প্রথা-ও সুবিধাবাদীদের মত দোহাই দিয়েছেন প্রকৃতিরই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন নারীদের থাকতে হবে ঘরে, আর জীবনধারণের জন্য নির্ভর করতে হবে পুরুষের উপর : *'যখন শারীরিক দুর্বলতা ও অলংঘনীয় অবস্থাভেদে মেয়েদের সেই গৃহের মধ্যে থাকতেই হবে তখন কাজে-কাজেই প্রাণধারণের জন্য পুরুষদের উপর তার নির্ভর করতেই হবে।'* মেয়েরা যে ঘরের ভিতরে থাকে এটাও এক উপকথা। সুবিধাভোগী শ্রেণীর নারীরাই ঘরে বন্দি থাকে, পুরুষকে সেবা ও দেহ দিয়ে ব্যবস্থা করে নিজেদের জীবিকার; কিন্তু অধিকাংশ নারী কাজ করে ঘরে ও বাইরে, যদিও তাদের বাইরের কাজ স্বীকৃতি পায় না, আর মূল্য পায় না ঘরের কাজ। রবীন্দ্রনাথ চিন্তিত উচ্চবর্ণের নারীদের সম্পর্কেই, এবং প্রকৃতির দোহাই দিয়ে তাদেরই আটকে রাখতে চান ঘরে। নিম্নশ্রেনীর নারীরা নরকে যাক

এটা তার ভাবনার ব্যাপার নয়। নারীর দুরবস্থা যে পুরুষতন্ত্রেরই চক্রান্তের ফল, এ কথার প্রতিবাদ করেছেন তিনি সমস্ত পুরুষতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে।

রবীন্দ্রনাথ নারী মুক্তির আন্দোলনের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে তাকে বলেছেন 'কোলাহল', এবং নারী-অধিনতাকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন এমন কথা, যা শুধু নারীমুক্তির বিরুদ্ধেই যায় না, যায় মানুষের সবরকম মুক্তির বিরুদ্ধেই :

> আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে, সেটা আমার অসঙ্গত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহণকে একটা ধর্ম মনে করত; তাতে এই হত যে, চরিত্রের ওপর অধীনতার কুফল ফলতে পারত না, অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমনকি অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদন করত। প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তাহলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না।

এর অর্থ হচ্ছে অধীনতা মেনে নেয়াই মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ অন্যায়। এ ধরণের বিশ্বাস অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এমন প্রতিক্রিয়াশীলতার উদ্দেশ্য সব রকমের শোষণকে তরল আধ্যাত্মিকতা দিয়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। নারী-আন্দোলন তাঁর কাছে অমঙ্গলজনক, তা হ'তে পারে; কিন্তু তা মঙ্গলজনক নারী আর অধিকাংশ মানুষের জন্য যারা বিশ্বাস করে সাম্যে। নারী-আন্দোলন 'অসঙ্গত' হবে কেন? কারণ তার বিশ্বাস পরাধীন থাকাই সঙ্গত; এধরণের বিশ্বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে দাঁড়ায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাওয়াও অসঙ্গত, যা সব সময়ই বলে সাম্রাজ্যবাদীরা। '*পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহণকে একটা ধর্ম মনে করত*' ব'লে তিনি যে সত্যে বিশ্বাস করতেন, তাও সত্য নয়। মেয়েরা পুরুষাধীনতাকে ধর্ম মনে করতো না, পুরুষেরাই ওটাকে ধর্ম বলে চাপিয়ে দিয়েছিলো নারীদের ওপর, যেমন বর্ণবাদকেও ধর্ম বলে চাপিয়ে দিয়েছে শক্তিমানেরা। প্রতিক্রিয়াশীলতার পক্ষে খুব বিশ্রী যুক্তি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : তাঁর মতে অধীনতা মেনে নিলে চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদিত হয়! এর অর্থ হচ্ছে খাঁটি দাসের চরিত্রই মহত্ত্বসম্পন্ন, বিদ্রোহী দাসেরা মহত্ত্বহীন। ভৃত্যের চরিত্রের মহত্ত্বরক্ষার উপায় হচ্ছে জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভৃত্য থাকা! রবীন্দ্রনাথ, যাকে মনে করা হয় নিজের সময়ের থেকে অনেক অগ্রসর, আসলে পিছিয়ে ছিলেন নিজের সময়ের চেয়ে হাজার বছর।

[চলবে]